স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন

(বোম্বাই প্রদেশে বেলগাঁও-র ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র লিখিত)

বেলগাঁ -- ১৮৯২ খ্রীঃ ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘন্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, 'ইনি একজন বিদ্বান বাঙালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।' ফিরিয়া দেখিলাম -- প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে। গোঁফদাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক চুরুট -- যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম।

তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কাএণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন -- অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।'

সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্তা হইল না; কিন্তু দুই-চারিটি কথা যাহা বলিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না, এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।

আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল -- এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনও দেখি নাই!

পরদিন ১৯ অক্টোবর। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লির ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম -- ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা?

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ-উকিল প্রশ্ন করিলেন, ‘স্বামীজী, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের ঐ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?’

স্বামীজী উত্তর করিলেন, ‘অবশ্যই উত্তম ফল আছে, ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পার, তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার, যখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বস, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, না -- কিছু পাপ করিতেছি মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।’

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, ‘ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে।’

স্বামীজী উত্তর করিলেন, ‘যে-কোন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়’ এবং এই বাক্যের সমর্থন শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, ‘হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খন্ডন হইতে পারে না।’

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে, তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, ‘বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুন্ন করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।’ পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, ‘আমি যাঁহার অতিথি, তাঁহার মত করিতে পারিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।’ উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমন্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স-দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার একগ্লাস ঠান্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে-সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল, সে-সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতঃপূর্বে ‘টাইমস্’ সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ‘ঈশ্বর কি?’ ‘কোন্ ধর্ম সত্য?’ প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিলিয়া যাওয়ায় আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, ‘লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।’ আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। ‘ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান, এককালে দুই-ই হইতে পারেন না’ -- খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহিত এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না।

স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ‘তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces -- centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces (বিপরীত শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite (বিপরীত) হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? All I can say is that you have a very poor idea of your God.’

আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস -- Truth is absolute (সত্য নিরপেক্ষ)। সমস্ত ধর্ম কখন এককালে

সত্য হইতে পারে না। তিনি সে-সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন:

আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে-সকলই আপেক্ষিক সত্য (Relative truths). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা করা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই সক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph (ফটো) লইলে একই সূর্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয় -- প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের -- তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য (Relative truth) - সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্পর্কে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'রাজা হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাস কি কখনও জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।' কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।'

'সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না?' -- প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, বল দেখি -- তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ; বাকি কতক অন্য কতকগুলি লোককে অপনার মনে করিয়া তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট! বাকি -- যকের মতো প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই তো গেল তোমার হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই, তাহা খাই; কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান? -- তুমি না আমি?' আমি তো শুনিয়া অবাক। ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে তো কাহারও সাহস দেখি নাই।

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোকপন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, 'স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।'

তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমরা যেরূপ utilatarian (উপযোগবাদী), যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্‌ গল্‌ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যে-সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?

তিনি বলিলেন, 'ঐ-সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়াছি।'

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কি ঘটনা ঘটিয়াছে, সে-সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল -- আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত তা জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে-সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেটজ্বালা যে এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও 'এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না' -- এই বলিয়া অপরের তাড়না বা গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাশা মাত্র।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া আমিও ঘুমাইতে গেলাম, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন -- আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০ অক্টোবর। সকালে উঠিয়া স্বামীজীকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হিয়াছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই শহরে আজ তাঁর চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসীদের -- নগরে তিন দিনের বেশি ও গ্রামে এক দিনের বেশি থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি ও-কথা শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, 'এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া-মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম, 'আপনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন।' পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতোমধ্যে আমার মনে হইল -- স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা হইবে, এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই -- এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী Pickwick Papers[১] হইতে দুই-তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম -- পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'দুইবার পড়িয়াছি -- একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ-ছয় মাস হইল আর একবার।'

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া

---

[১] Charles Dickens-লিখিত

পুনরায় উহা assimilate করা চাই।’

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্তিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছু হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দেকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শউনইয়া বলিলেন, ‘যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে -- সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পূজা-পাঠ যেমন এক মনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটিটি মাজাও তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মতো দেখাইত।’

এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের -- ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই, আমায় না জানাইয়া আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার দ্রব্য ব্যবহার করিলে তো উহা চুরি করা হয় না। তার পর পশুপক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিস নষ্ট করিলে তাহাকেও তো চুরি বলি না।’

স্বামীজী বলিলেন, ‘অবশ্য সর্বাবস্থায় সকল সময় মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিস বা কার্য নাই। আবর অবস্থাবেদে প্রত্যেক জিনিস মন্দ এবং প্রত্যেক কার্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে শারিরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্বলতা আসে, সে কর্ম করিবে না; উহাই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিস কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি না? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই দুই-দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণিকে দুহখ দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচো ক্ষতি নাই -- কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না; কিন্তু শহরে ঐরূপ করিলে পুলিসের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।’ ন

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রসরঙ্গ চলিতেছে; বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্ন সমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত -- ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই তো দেখিতেছিলাম, আমাদের মতোই একজন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষাই লইতে আসিত, সকল সময়েই তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। নানা লোকে নানা ভাবেও আসিত: কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোশগল্প শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে জর্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দন্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটির পরিক্ষা এড়াইবে বলিয়া স্বামীজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশি বেশি আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।’

স্বামীজী বলিলেন, 'উহার পরিক্ষা কাছে, পরিক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম. এ. পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও; বরং এম. এ. পাশ করা সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।'

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম হইত। ঐসময় একদিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে।

কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ি ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।' সেও তাহা স্বীকার করে। স্বামীজীর আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর কি?' সেও সাগ্রহে বলিল, 'উনি কি গুরু হইবেন? হইলে তো আমরা কৃতার্থ হই।'

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?' স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।' গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক -- প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং ২৫ অক্টোবর, ১৮৯২, আমাদের দিক্ষাপ্রদান করিলেন। এখন আমার ভারী ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর ফটো তুলিয়া লি। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮ তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন এবং ফটো লইয়া হইল। ইতঃপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহসত্ত্বেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া দুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিবার কথা আমাকে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে স্বীকার করিলাম।

একদিন স্বামীজী বলিলেন, 'তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাইব।' আমি চাঁদার লিস্ট করিয়া টাকা-সংগ্রহের প্রস্তাবকরায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্তে একজোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে কোলাপুরের রানী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামীজীকে কিছু গ্রহণ করাইতে না পারিয়া অবশেষে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজীও গেরুয়া দুইখানি গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়াছিলেন, সেগুলি সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্‌গীতা অনেকবার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন (Jules Verne)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-

এর Sartor Resartus তাঁহার নিকটেই পড়িতে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, 'যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাবে, নতুবা নহে। Nervous debility (স্নায়বিক দুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ-সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশি লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্বদা 'রোগ রোগ' করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মতো একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূর যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।'

এই সময়ে আবার অনেক কারণবশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও একদিনের জন্য সুখী হই নাই। তাঁহাকে এসমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কিসের জন্য চাকরি করিতেছ? বেতনের জন্য তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বল দেখি -- যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, অফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরোয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে -- আমরা দেখি। আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা -- এ-কথা যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটাই দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের এক নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা কি -- এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বলিলেন। 'যাহা অভীষ্ট কার্যের সাধনভূত, তাহাই ভাল; আর যাহা তাহর প্রতিরোধক, তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচু-নিচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই-ই এক হইয়া যাইবে। চন্দ্রে পাহাড় ও সমতল আছে -- বলে, কিন্তু আমরা সব এক দেখি, সেইরূপ।' স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল -- যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

আর একদিনের কথা -- কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামীজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়। কেন -- জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন: দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখন শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ-কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোকে মরে।

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই-চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ-গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরও অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সেজন্য আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশি দেওয়া বাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটি পয়সা, সেজন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্বয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এ-সব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সে সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বই লোকসান নাই। কেন না, তোমার মতো লোকেরা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে সে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা দুই পয়সা ভিক্ষা করিয়া গাঁজা টানিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ঐ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নাই।

প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজীকে যাঁহারা প্রথম দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন না -- সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মতো শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদি আবশ্যক নাই -- কোন লোক একবার এই কথা বলায় তিনি বলেন: দেখ, মন বেটা বড় পাগল -- ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেইজন্যই সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহাদের খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখন এনটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনি স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি -- মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম: স্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।

তিনি বলিলেন: নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়া আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'রামকেষ্ট বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেন: ইহাউ আমার Famine Insurance Fund -- যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু মার চর্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia (অজীর্ণতা) -প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও।

স্বামীজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ‘ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস’; তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা -- Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁর বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য -- একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন: পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে আনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেইজন্য এত লঙ্কা খাই।

রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাহা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, এ কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কিন নির্বোধ লোক এজন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন: হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া সৎকার্য করাইতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি! গরিব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গল-বিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হইবে।

বাগ্‌বিতন্ডায় ধর্ম নাই, ধর্ম অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন: Test of pudding lies in eating, অনুভব কর, তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল, নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।

আমি বলিলাম, কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্মলাভের প্রধান সহায় -- আপনি যাহা বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দন্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন: কখনও ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম করিও। কেহ দোষ করে, দন্ড দিবে; কিন্তু দন্ড দিতে গিয়া কখনও রাগ করিও না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন:

এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানে পুলিস ইনস্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাহার বেতন ১২৫্ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসার খরচ মাসে দুই-তিন শত টাকা হইবে। যখন বেশি জানাশুনা হিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার তো আয় অপেক্ষা খরচ বেশি দেখিতেছি -- চলে কিরূপে? তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থানে যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন, তাঁহাদের ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা-কড়ি বাহর হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকা-কড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস কিছু লই না।'

স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য; তিনি বলিলেন, 'There can be no two infinities' আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন: আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত -- এ কথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিস অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখিবে -- সময়ও যাহা, আকাশও তাহাই; আরও অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সেই-সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।

এইরূপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭ তারিখে বলিলেন, 'আর থাকিব না; রামেশ্বর যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছানো হবেনা।' আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭ অক্টোবর মেল ট্রেনে তিনি মর্মাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, 'স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।'

* * *

স্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম -- আমেরিকা যাইবার পূর্বে; সেবারকার দেখার কথা অনেকটা বলিলাম। দ্বিতীয় -- যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন, তাহার কিছু পূর্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয় তাঁহার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজে দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশি কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে, অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও-কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য করা কর্তব্য

বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করিব।

ভন্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আর একদিন কথা উঠায় বলিলেন: অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেন্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরো একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মতো ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া খাইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্যন্ত তাহার ব্যবহার করার জো নাই। কেন, তাহারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই -- এহা ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।

স্বামীজী বলিতেন: দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানসিক ভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের প্রত্যেকেই নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গন্ডগোল উপসথিত হয়। প্রত্যেকেই চায়, বিষয়টা অপর সকলেই তাহারই মতো দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ও-রূপ ভাব কোনমতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নে।

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ-কাল-পাত্রভেদে নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকার প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়-ভ্রমণকাএ আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারের ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একটি স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয় -- এরূপ ভাবা কি অন্যায় নহে?' আমি তো শুনিয়া অবাক!

নাসিকা এবং পায়ের খর্বতা লইয়াই চীনের সোন্দর্য-বিচার, এ-কথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরেজ আমাদের মতো সুবাসিত চাউলের অন্ন ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজ-সাহেবের অন্যত্র বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার তাঁহার সম্মানার্থে উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজ-সাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত কাইয়া উহা পছা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, 'You ought not to have given me rotten rice' -- (তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই)।

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম; সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আঘ্রাণ লইয়াই বলিলেন, 'এ তো অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ বল?' এইরূপে গন্ধ, আস্বাদ, সোন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ-দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশুপক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এইজন্য প্রাণ ছটফট করিত। মারিতে না

পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ও-রূপ প্রাণিবধ একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিসটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানয়ষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা জায়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্দে একটি গল্প বলিতেন: এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবদলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহাসভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনিয়র, সূত্রধর, চর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনিয়র বলিলেন, 'শহরের চারিদিকে বেড় দিয়া এক বৃহৎ খাল খনন কর।' সূত্রধর বলিল, 'কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক।' চামাড় বলিল, 'চামড়ার মতো মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া দাও।' কামার বলিল, 'ও-সব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসিতে পারিবে না।' উকিল বলিলেন, 'কিছুই করিবার দরকার নাই; আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই -- এই কথাটি তাহাদের তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হউক।' পুরোহিত বলিলেন, 'তোমরা সকলেই বাতুলের মতো প্রলাপ বকিতেছ। হোম যোগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না।' এইরূপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহারা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করিল। এই রকম করাই মানুষের স্বভাব!

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্দে একটি কথা মনে পড়িল, স্বামীজীকে বলিলাম, 'স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সহিত আলাপ করিতে বড় ভালবাসিতাম। একদিন একটি পাগল দেখিলাম বেশ বুদ্ধিমান, ইংরেজীও একটু-আধটু জানে; তার চাই কেবল জল খাওয়া! সঙ্গে একটি ভাঙা ঘটি। যেকানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নূতন একটা জলের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান করিত। আমি তাহাকে এত জল খাইবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, 'Nothing like water, sir!' -- জলের মতো কোন জিনিসই নেই মশাই! তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোন মতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'এটি ভাঙা ঘটি বলিয়াই এত দিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুরি করিয়া লইত।'

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, 'সে তো বেশ মজার পাগল! ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে, পাগলের তাহা নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগ-শোক-অহঙ্কারে, কাম-ক্রোধ-হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্বল হইয়া ঐ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তখন বলি, ও লোকটা খেপেছে। এই আর কি!'

স্বামীজীর স্বদেশনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, 'যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?'

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে আনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ-কথা স্বীকার করিতেন, 'সে-সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মতো গর্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street.' (ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে,

লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়।)

খ্রীষ্টান মিশনারীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশের কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ‘কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। শ্রদ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ-কথা কেহ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাঁহাদের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনারী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।’

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম:

সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় ব্রিত; কিন্তু খুব কম লোকই সুখী। কাজকর্মও সকলে আনবরত করিতেছে, কিন্তু তাহার অভিলষিত ফল পাইতে প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত সিবার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেইজন্যেই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাস-বলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নাই, তখনই জানিবে যে, তাহার কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে -- এই মুহূর্তে হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞান ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-মিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করে এবং উচ্চশ্রেণীর বহুব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হয়। সম্রাট আলেকজেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেইজন্য তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরুপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে সাহায্য করে মাত্র।

কর্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না; কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই

হইবে। আর সেজন্য কর্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয় ভোগ-জনিত আপাত-সুখলাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করিয়া যাইতে হইবে। উহার নাম নিষ্কাম কর্ম, গীতাতে ভগবান অর্জুনকে তাহারই উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, 'কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর।'

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিবদ্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা?' উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর। তিনি বলিলেন: গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মতো এত ধূমধাম ছিল না; সজন্য তোমাদের মতো লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কিনা, সেজন্য তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেহ -- শ্রীভগবান সারথি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগে তামাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান যখন তোমাদের নিকট মূর্তিমান হইয়া আসিলেও তোমারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ছুট ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পারো যদি তো গিতার উপদেশগুলি যতটা সম্ভব জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুনে কি হবে?' আমার বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation (ব্যক্তিগত ব্যাপার) -- অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থায় উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপজোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।

শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, স্বামীজী একদিন তাহা অতি সুন্দরভাবে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন, 'অনধিকার চর্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তি ক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum-total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity -- অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, উহা সীমাবদ্ধ; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্মের গভীর সত্যসকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেইজন্যেই ধর্মপথের পথিকদিগের প্রতি -- বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা শক্তিসংরক্ষণের উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।'

স্বামীজী বাঙলাদেশের পল্লীগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লীগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জল-শৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারী বিরক্ত ছিলেন।

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক একখানি পুস্তক হইত। একই

প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত-সহায়ে এমনি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে ক্লান্তিবোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াও চর্চা করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মতো আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সে-বিষয়ে দু-চারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা।

স্বামীজী বলিতেন: চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম -- সবই একত্বের দিকে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যতরকম জিনিস দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ-সমস্ত জিনিস ৯৩টা মূল দ্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

ঐ মূল দ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র -- বোঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভীন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থ চেতন ও অচেতন এবং উদ্ভিদ -- এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল -- উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণির ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল -- চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা জাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।[২]

পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম্ন জমি দেখা যায়, তাহাও সতত সমতল হইয়া একভাবে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উচ্চ জমি ধুইয়া গিয়া গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উষ্ণ জিনিস কোন জায়গায় রাখিলে উহা ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি (conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ (prism) কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক সাদা রং রামধনুর সাতটা রঙের মতো পৃথক পৃথক বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

এইরূপ যাহা সত্য তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবমম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞান উপস্থিত হইলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না।

---

[২] স্বামীজী যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু-প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনবৎ আচরণ (Response of Inorganic matter to Electric current) -- এই অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশীত হয় নাই।

এই সব কথা শুনিয়া বলিলাম, 'স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন উহারা ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়া গিয়াছে। মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical illusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হইতেছে। Fluorspar নামক পাথরের নিচে একটা রেখাকে double refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উডপেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক-একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিস যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়া থাকে, কেন না তাহাদের চোখের লেন্স বিভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাহাই যে সত্য, তাহারও তো প্রমাণ নাই। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন: মানুষ 'সত্য সত্য' করিয়া পাগল, কিন্তু প্রকৃত সত্য (Absolute Truth) বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, কারণ ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা সে বুঝিবে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব Absolute ভগবান বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝিতে পারিবে না।

স্বামীজী -- তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বল? অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া দুই-রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যা-জ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত।

আমি -- স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুইটি জিনিস থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, তাহাও তো মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলিতেছেন, তাহাও তো সত্য হইতে পারে।

স্বামমীজী -- ঠিক বলিয়াছ, সেইজন্যেই বেদে বিশ্বাস করা চাই। পূর্বকালে আমাদের মুনিষিগণ সমস্ত দ্বৈত্যজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অদ্বৈত্য সত্য অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া -- ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব -- কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য? শুধু দুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাকো, তখন অন্যটাকে ভুল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলিকাতায় কেনাবেচা করোলে, উঠিয়া দেখ -- বিছানায় শুইয়া আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন এক ভিন্ন দুই ন দেখিবে না এবং পূর্বের দ্বৈত্যজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এ-সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? ধর্ম অনুভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নহে। হাতেনাতে করিতে হইবে, তবে ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। এ-কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), (ভূতত্ত্ববিবদ্য) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু-বোতল hydrogen (উদজান) আর এক বোতল oxygen (অম্লজান) লইয়া 'জল কই?' বলিলে কি জল হইবে, না তাহাদের একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া electric current (তড়িৎ প্রবাহ) তাহার ভিতর চালাইয়া তাহাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে জল দেখিতে পাইবে এবং বুঝিবে যে, জল hydrogen ও oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাস তো কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রহিয়াছে। একমুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হইল, আর বলিলে কিনা, 'কই, আমি তো সব এক দেখিতেছি না!'

আমি -- স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হইলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) আসিয়া পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে আর চেষ্ট আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন আমারও হইবে।

স্বামীজী -- তাহা নহে। কর্মফল তো অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ-সকল কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে পারে। ম্যাজিক-লণ্ঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখানো যায়, আবার দেখাইতে দেখাইতে সমস্ত রাতও কাটানো যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর: সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই চেতনে ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্ট বস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মতো রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মানুষ লেজবিহীন বানরবিশেষ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশি। যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশ-মাত্র -- এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বুঝিবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া 'এটা কি, ওটা কি?' অনিসন্ধান করিতে লাগিলেন: আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ার ও উর্বর ভূমিতে শরীর-রক্ষার জন্য যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন পরিয়া প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বসিয়া আদা-জল খাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন, 'এমন জিনিস কি আছে, যাহা জানিলে সব জানা যায়?' তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত হইতে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্মান্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বাচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র। কাল এবং আকাশও (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, জাহার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটা কি মনে হয়? সূর্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সঢর্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখন্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি! আকাশ বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশ বই আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মতো অনির্বচনীয় একি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক; তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ-সকল অনন্ত পদার্থই এক, এবং একই ঐ-সকলরূপে প্রকাশিত।

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস -- যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'সত্য না হইবার তো কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণস্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি?'

এই-সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আপনিই সবই বুঝিতে

পারিতেছেন, এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।’

স্বামীজী বলিলেন, ‘প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা যে-উপায়েই হোক, পরে সব আপনিই হইবে। আর জ্ঞান -- অদ্বৈতজ্ঞান ভারী কঠিন; জানিয়া রাখো যে, উহা মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal), কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অনুভব করিবার অন্য উপায় নাই।’